রিঅ্যাকশন টাইম

আবীর হাসান

রিঅ্যাকশন টাইম! হ্যাঁ, প্রতিক্রিয়ার সময় কতটা সংক্ষিপ্ত হলে আপনি সন্তুষ্ট হন? ভেবে দেখেছেন প্রশ্নটা? ধরুন কাউকে কোনো প্রশ্ন করলেও কিংবা নিতান্ত একটা হাসির কথাই বললেন/লিখলেন, তার প্রত্যুত্তরের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারেন আপনি? কিংবা কতটা দেরি হলে আপনি বলবেন 'গণ্ডারের হাসি'! বাংলা এই বাগধারাটা কিন্তু রিঅ্যাকশন টাইম নিয়েই।

মানুষের জীবনযাত্রায় এ এক অপরিহার্য বিষয়। তথ্য জানা এবং জানানোর জন্য উদগ্রীব, অপেক্ষা থাকবেই। আগে অপেক্ষার সময়টা দীর্ঘ ছিল, এখন কমেছে। আগে মানুষ চিঠি লিখে সপ্তাহ-মাস অপেক্ষা করত, কিন্তু এখন! ধরুন কাউকে এসএমএস করে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন অথবা ফেসবুকে কোনো স্ট্যাটাস দিলেন কিংবা টুইটারে কোনো মন্তব্য লিখলেন, তারপর রিঅ্যাকশন জানতে অপেক্ষা করবেন তো দুই-চার-দশ মিনিটের বেশি নয়– তাই না?

এ প্রসঙ্গে একটা কাহিনী বলা যেতে পারে– জানুয়ারি মাসের ২৩ তারিখের ঘটনা। বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম টেনিস টুর্নামেন্ট অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটিয়েছিলেন নবাগত মার্কিন খেলোয়াড় স্লোয়ান স্টিভেন্স। তিনি হারিয়েছিলেন তার স্বদেশী তারকা খেলোয়াড় সেরেনা উইলিয়ামসকে। তবে আমাদের কাহিনী ওই ব্যাপার নিয়ে নয়। আমাদের কাহিনী শুরু খেলার শেষে। সাধারণত টেনিস কোর্টে আমরা দেখি বিজয়ীরা কোচ অথবা প্রিয়জনকে আলিঙ্গন করতে ছুটে যান। কিন্তু স্লোয়ান তা করেননি। তিনি ছুটে গিয়েছিলেন তার ব্যাগের দিকে আর দ্রুত বের করে এনেছিলেন তার স্মার্টফোনটি। কারও সাথে কথা বলেননি বেশ কিছুক্ষণ, শুধু কী যেনো দেখছিলেন। সাংবাদিকদের কাছে ব্যাপারটা ছিল ব্যতিক্রমী এবং এরা প্রশ্নও করেছিলেন স্লোয়ানকে 'কী করছিলেন'? খুব সহজ একটা উত্তর দিয়েছিলেন টিনএজ স্লোয়ান। বলেছিলেন, টুইটার চেক করছিলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পেয়েছি ১৪৫টি কমেন্ট। সাথে এও বলেছিলেন, 'আমি যে ফেসবুক আর টুইটার প্রজন্ম।' বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটেছিল এক ঘণ্টার মধ্যে। সতের হাজার টুইট পেয়েছিলেন স্লোয়ান স্টিভেন্স। পাঁচ ঘণ্টা পর সেটা হয়েছিল চল্লিশ হাজার।

হ্যাঁ, এই হচ্ছে এ প্রজন্মের রিঅ্যাকশন টাইম। দশ বছর আগে তা কেউ চিন্তাও করতে পারত না। আশাটাও ছিল ধীরগতির। অনুযোগ হয়তো ছিল, কিন্তু মেনে নিত সবাই। এখন মানে না, আশা করে দ্রুত জানুক এবং জানাক। প্রাচীন মানুষেরা একে ধৈর্যহীনতা বলতে পারেন, কিন্তু স্লোয়ানের ওই গর্বিত উচ্চারণটাকে আমাদের মনে রাখতে হবে– 'প্রজন্মটাই যে ফেসবুক-টুইটারের'। অর্থাৎ নবপ্রযুক্তির।

যারা এখনও কৈশোর পেরোয়নি, তারা তো বুদ্ধি পেকে ওঠার সময় থেকেই প্রযুক্তিগুলোকে দেখছে। ওরা বেড়ে উঠছে আর তার সাথে সাথেই প্রযুক্তিগুলোও উন্নত এবং দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। এ যুগে আবেগকে কেউ আর রেখে-ঢেকে-চেপে রাখে না, মনের কথা-প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তাৎক্ষণিকভাবে। অনেকে বলবেন বিড়ম্বনাও তো কম হচ্ছে না। হচ্ছে– অপছন্দ, কপটতা, স্ববিরোধিতা এসব বিষয় নিয়ে লিখে, চাকরি, ব্যবসায়, সংসার, রাজনীতিতে অনেক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে ইতোমধ্যে, দেশে-বিদেশে সর্বত্রই। কিন্তু মনে রাখতে হবে ওগুলোই সবটুকু নয়। কর্মজীবনের যে কয়টা জটিলতা, সাংসারিক সঙ্কট কিংবা রাজনৈতিক বিপর্যয়ের খবর চাউর হয়েছে, সে তুলনায় শুভ-সম্ভাবনাময় ঘটনা কিন্তু অনেক অনেক গুণ বেশি। আর এই বেশির কারণে বাণিজ্যিক রমরমাও বেশ ভালোই। অর্থাৎ এই নতুন প্রযুক্তির বাণিজ্য যে প্রতিষ্ঠানগুলো করছে, যারা নতুন প্রজন্মের জন্য জানালা-দরজা খুলে ধরেছে, তারা এই বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও বেশ ভালো করছে। ভার্চুয়াল বাণিজ্যের 'ভ্যালু ক্যালকুলেশন' ক্রমাগত বিস্ময়ের জন্ম দিয়ে চলেছে। ঠিক দু'বছর আগে ব্রিটেনের দ্য ইকোনমিস্ট পত্রিকা একটি প্রশ্নসূচক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল, যার মোদ্দা কথা ছিল 'ফেসবুক কোম্পানির ভ্যালু পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার হবে কিনা?' শেয়ারবাজারে ফেসবুককে অবলম্বন করার উদ্দেশ্যেই ওই রক্ষণশীল ধরনের প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু সে সময় কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাননি ফেসবুকের স্বত্বাধিকারীরা। এর নয় মাসের মাথায় জুকারবার্গ যখন শেয়ারবাজার থেকে ১৩০ মিলিয়ন ডলার তুলে নিয়েছিলেন, তখন নিশ্চয়ই ওই পত্রিকাটি সঠিক উত্তরটা পেয়ে গিয়েছিল চপেটাঘাতসমেত।

নতুন প্রযুক্তির ভার্চুয়ালিটিভিত্তিক কোম্পানিগুলো রিয়াল মার্কেটপ্লেসে যেভাবে মান অর্জন করছে কিংবা ভ্যালু বাড়াচ্ছে, তা প্রাচীনপন্থীদের মনে বিস্ময়-উদ্রেক তো করছেই, হিংসাও যে বড়াচ্ছে তা বলাবাহুল্য। তবে এটাও ঠিক, সবাই সব কিছু সময়মতো করতে পারছে না। না করতে পারায় যন্ত্রণা তো একটা থাকেই। সে কারণেই আমাদের মতো দেশে শুধু নয়, উন্নত দেশেও একটা সন্দেহবাতিক প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে।

নতুন প্রযুক্তির অন্য একটি ব্যাপারও আছে– সেটা হচ্ছে উদ্ভাবন এবং তার বাণিজ্যিকীকরণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এখন অনেকেই ব্যবহার করছে, কিন্তু তা বাণিজ্যিক বা অর্থকরী ব্যবহারের বিষয়টা কিন্তু অনেকেই উপেক্ষা করছে। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ বিষয়টা বেশি ঘটছে প্রথাগত বাণিজ্যের আবহে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে যেনো জোর করে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, একটা 'অপশন' হিসেবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় এবং ব্যাংকিং খাতে সেই পুরনো উপায়েই চলছে বাণিজ্যিক বিষয়গুলো, শুধু 'কথা' বদলেছে– বলা হচ্ছে 'হার্ড কপি' লাগবেই। অনলাইন ট্রেডিং, ই-কমার্স, ই-টেন্ডার বিষয়গুলো যেনো আপ্তবাক্যে পরিণত হয়েছে। আর এর ফলস্বরূপ বাংলাদেশে গত বছর আইসিটি ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়লেও আর্থিক খাতের রেটিং কমেছে। অথচ আর্থিক ও বাণিজ্যিক খাতের ব্যবস্থাপনায় আইসিটিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা আগের তুলনায় অনেক উন্নত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তিগুলো ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এর প্রায়োগিক বিষয়গুলো অনুপস্থিত। এছাড়া অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলায় নিজস্ব পদ্ধতির সল্যুশন তেমন একটা চোখে পড়ছে না।

মেধা বা আইডিয়ার ঘাটতি আছে– একথাও কিন্তু বলা যাবে না। লোকবল নিয়ে যে সমস্যা ছিল, তাও অনেকটা মিটেছে। কিন্তু সমস্যা হয়েছে পৃষ্ঠপোষকতার। নীতি নির্ধারণ পর্যায়ে রাজনৈতিক সরকার আইসিটিবান্ধব আচরণ করলেও আমলাতন্ত্র এখনও পর্যন্ত প্রাচীনই রয়ে গেছে। নতুন প্রজন্মকে জায়গামতো সুযোগ দেয়ার ক্ষেত্রে গড়িমসিটা লক্ষণীয়। বিপরীতে লক্ষ করলে দেখা যাবে অনলাইনে নতুন প্রজন্ম খুবই অ্যাকটিভ। অ্যাকটিভ বটে, কিন্তু তা প্রোডাক্টিভ কিনা, সে প্রশ্নটিই এখন বাংলাদেশের জন্য বড় হয়ে উঠেছে।

প্রোডাক্টিভ হলে রেটিংয়ে অবনমন হতো না নিশ্চয়ই। কিন্তু কেনো হলো না? থ্রিজিরও তো প্রচলন হলো, অথচ তা আইসিটি উৎপাদিকা শক্তিকে প্রভাবান্বিত করতে পারল না! এখন কিন্তু এ বিষয়গুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট সবার ভাবা উচিত। প্রজন্মের দোষ দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। তারা কোনো না কোনোভাবে প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত। স্লোয়ান স্টিভেন্স যা মুখে বলেছেন তা এদেশের তরুণেরা মনে মনে বলে এবং আশা করি আলোকিত দরজা-জানালাগুলো খুলে যাবে। কিন্তু দ্রুত যখন তারা কিছু করার চেষ্টা করে তখন দেখে সামনে প্রাচীনপন্থার বাধা।

এসব কথাও আসলে অনেক দিন থেকে বলা হচ্ছে। অধ্যাপক আবদুল কাদের এই কথাগুলো বলার জন্যই প্রকাশ করেছিলেন কমপিউটার জগৎ নামের মাসিক পত্রিকাটি। এখন পর্যন্ত এদেশের আইসিটিভিত্তিক অর্জনগুলোর অনেক ক্ষেত্রেই অধ্যাপক আবদুল কাদের এবং কমপিউটার জগৎ-এর অবদান অনস্বীকার্য। তবে অতীতকে ভেঙে বেশিদিন খাওয়া যায় না। আইসিটির ক্ষেত্রটা যেনো আরও 'ভয়াবহ'। আজ যা নতুন, আগামীকালই তা পুরনো। যে

(বাকী অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়)

রিঅ্যাকশন টাইম

(৩৮ পৃষ্ঠার পর)

গতি আজ বিস্ময়কর, আগামীকালই তাকে বলা হবে ওটা কিছুই নয়। অর্থাৎ নতুন উদ্ভাবন এসে পুরনোকে সরিয়ে দিচ্ছে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটাই হয়তো ঘটছে যে একটি বিষয় বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা করতে করতে নতুন প্রযুক্তি এসে পড়ে আর আগের প্রযুক্তিভিত্তিক পরিকল্পনাকে ম্লান করে দেয়। আবার কিছু বিষয় আছে যেগুলো পরিকল্পনার পর্যায়েই থেকে গেল, বাস্তবায়ন হলো না– আইসিটি পার্ক যার অন্যতম উদাহরণ। এছাড়া সরকারি উচ্চতর পর্যায়ের অনলাইন ভীতি কাটানো, আইসিটি ক্যাডার সার্ভিস প্রবর্তন, টাইমিংয়ের বদলে যথাযথ কমপিউটিং, থ্রিজির উৎপাদনশীল ব্যবহারের পথনির্দেশ– এ বিষয়গুলোও এখন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

আবার এটাও এদেশের বাস্তবতা, আমলাতান্ত্রিক গ্যাঁড়াকলটা শুধু সরকারি পর্যায়েই নেই, বেসরকারি পর্যায়েও আছে। ধীরে চলার নীতিটাও সর্বত্র বিরাজমান। আইসিটি কিন্তু ধীরে চলার নীতি মানে না। বছর বিশেক আগের একটি স্মৃতি মনে পড়ছে। ইন্টেলের প্রসেসর এবং গর্ডন মুর'স ল'র গবেষণা নিয়ে একটি লেখা তৈরি করেছিলাম কমপিউটার জগৎ-এর জন্য। লেখাটি পাঠানোর পর রাত সাড়ে ১১টার দিকে অধ্যাপক আবদুল কাদের ফোন করলেন (ল্যান্ডফোনে)। বললেন মুর'স ল'র বিষয়টা একটু বিষদভাবে লিখতে। কারণ হিসেবে বললেন, আইসিটির জগৎটা যে কত দ্রুত পাল্টায় (প্রতি ছয় মাসে শক্তি বৃদ্ধি ও দাম কমা) সেটা যাতে সবাই উপলব্ধি করেন, বিশেষ করে নীতিনির্ধারকেরা যেনো বুঝতে পারেন।

শেষ কথা

সমস্যাটা এখানেই, আমাদের হাতে প্রযুক্তি আছে, কিন্তু রিঅ্যাকশন টাইমটাকে আমরা প্রলম্বিত করতে চাচ্ছি। অথবা সঠিক কর্মপরিকল্পনা না থাকায় সময়মতো প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারছি না। সমাজের দিকে তাকালেও দেখা যাবে প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলতা আইসিটি এবং ডিজিটাল উন্নয়নের গতিশীলতাকে গ্রাস করতে চাচ্ছে। উৎপাদনশীলতার মূল বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে ভাবজাগতিক বিষয়ে আইসিটিকে ব্যবহার করতে চাওয়াও এর একটা অন্যতম কারণ। আইসিটিতে অনেক বিষয়ই আছে, যা নিতান্ত ব্যক্তিগত বা অপেশাদার। সেগুলোকে পেশাদারিত্বের মোড়ক দেয়ার চেষ্টা খুব বেশি ফলপ্রসূ হওয়ার নয়। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কাল্পনিক আবহ সৃষ্টি করতে চাইলে তাতে নিজের লাভ হবে না– লাভ হবে যারা বাণিজ্য করছে তাদের। ক্ষতি বা সময়ের অপচয় হলে আমরা তাদের গালাগাল করতে পারি, তার বেশি কিছু করা কিন্তু সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেয়া যায়। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় একটি টার্ম ব্যবহার করা হয়, যাকে বলা হয় এসডিএস (SDS)-সেইং-ডুয়িং-শোয়িং। অর্থাৎ বলা, করা এবং দেখানো। এ ক্ষেত্রে বলার বিষয়টি ব্যাখ্যা করা এভাবে– 'সাধারণ মানুষ বলার সময় অনেক অনভিপ্রেত শব্দ ব্যবহার করে, যা তার বা তাদের বাক্যের প্রায় ৪০ শতাংশ সময় নষ্ট করে। একজন প্রেজেন্টারকে অবশ্যই ওই ৪০ শতাংশ সময় সাশ্রয় করতে হবে।' সেলফোনে কথা বলার ক্ষেত্রেও কিন্তু ওই সমস্যাটাই হয়। বেশিরভাগ মানুষ অনেক অনভিপ্রেত শব্দ ব্যবহার করে সময় নষ্ট করে (নিজের অজান্তে) কথা বলার সময়। ফলে বিল বাড়ে এবং দোষ দেয়া হয় অপারেটরের। দ্রুত গুছিয়ে কথা বলা শিখতে পারলে কিন্তু সমস্যাটা মিটে যায়।

রিঅ্যাকশন টাইমের ভ্যালু বুঝলেই শুধু এ ধরনের সমস্যা নিরসন সম্ভব। সেই কবে (অন্তত ১৫ বছর আগে) বিল গেটস লিখেছিলেন– বিজনেস অ্যাট দ্য রেট অব থট (Bassiness&thoght)– চিন্তার গতিতে বাণিজ্য এখন আর ভবিষ্যদ্বাণী নয়– যে সময়টা সমাগত। এ প্রজন্মের সবাই ভাবছে কেনো এত দেরি করে দ্রুতই তো অনেক কিছু করা যায় ফেসবুক-টুইটারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার মতো। তাদের ভাবনাগুলোকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা করি না কেনো আমরা!! কজ

ফিডব্যাক : abir59@gmail.com